শিরক ও কুফর, নিফাক, আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা, সীরাত ও জীবনী সম্পর্কিত কিছু লেখা এবং ফতওয়া

সূচিপত্রঃ

১। শিরক ও কুফর

পরিচ্ছেদঃ

ক। *শরীয়তের বদলে অন্য বিধান গ্রহণকারীদের ব্যাপারে ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফতোয়া*

খ। *শাসকের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী দেখা গেলে করণীয় সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের ইজমা*

গ। *গণতন্ত্র সম্পর্কে পূর্বসূরী ও বর্তমান আকাবীরদের অভিমত*

ঘ। *শরিয়াহর পরিবর্তে আইন রচনাই কি ইসলাম ত্যাগের জন্য যথেষ্ট? নাকি অন্তর থেকেও অবিশ্বাস জরুরী?*

ঙ। *বেরলবী মতবাদ – ভিত্তিহীন আক্বীদা ও ভ্রান্ত ধারনা – মাওলানা আব্দুল মালেক (দাঃ বাঃ)*

২। নিফাক

৩। আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা

পরিচ্ছেদঃ

ক। *যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর ফতোয়া*

খ। *আমি এমন বাবার সাথে কেমন আচরণ করবো যে তাগুতের নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকুরি করে?*

গ। *আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পুলিশ বিভাগে চাকরি করা সম্পর্কে*

৪। সীরাত ও জীবনী

পরিচ্ছেদঃ

ক) *শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী*

শিরক ও কুফর

১। ক) শরীয়তের বদলে অন্য বিধান গ্রহণকারীদের ব্যাপারে ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফতোয়াঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন-ব্যবস্থা কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণেতা হিসেবে আল্লাহর চাইতে উত্তম কে আছে? (সূরা মায়েদা: ৫০)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير

(এই আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যারা আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে দেয়, অথচ তা (আল্লাহর বিধান) সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে এবং সকল ক্ষতিকারক বিষয় থেকে নিষেধ করে। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে সে ফিরে যায় মানবরচিত মতামত, খায়েশাত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে যা আল্লাহর শরীয়াতের সাথে সম্পর্কহীন। এ কাজটিই করেছিল জাহেলী যুগের মানুষেরা। তারা তাদের মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তাধারা ও খায়েশাত দিয়ে তৈরী বিধান দ্বারা ফায়সালা প্রদান করতো।

আর তাতারীরা রাজতান্ত্রিক রাজনীতির সুবাদে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে আইন গ্রহণ করে এভাবেই বিচার ফায়সালা করছে। এই চেঙ্গিস খানই তাদের জন্য 'ইয়াসিক' (তাদের সংবিধান) প্রণয়ন করেছিল যা দ্বীন ইসলামী, খ্রীষ্টান ধর্ম, ইয়াহুদী ধর্ম সহ বিভিন্ন শরীয়াতের আইনের সমন্বয়ে গঠিত। তাতে এমন অনেক বিধানও ছিল যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় এক আইন-বিধান রূপে। ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহর উপর স্থান দিয়েছিল।

যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাতের দিকে ফিরে আসে, এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা কম কিংবা বেশী কিছুমাত্রও ফায়সালা করে না।" (তাফসীর ইবনে কাসীর)

উপলব্ধি:

– এদেশের একদল রাজনীতিবিদও কি কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে মানবরচিত মতামত, খায়েশাত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে ফিরে যাচ্ছে না, যা আল্লাহর শরীয়াতের সাথে সম্পর্কহীন?

– এদেশেও কি “তথাকথিত গণতন্ত্রের” দোহাই দিয়ে তাতারীদের মতো বাদশাহ চেঙ্গিস খান এর উত্তরসূরীদের (ব্রিটিশ ও আমেরিকান আইন) থেকে আইন গ্রহণ করে বিচার-ফায়সালা করা হচ্ছে না?

– এদেশেও কি একটি “তথাকথিত সংবিধান” রচনা করা হয় নি তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা থেকে? আর সেটাই কি অনেকের কাছে অনুসরণীয় একমাত্র আইন-বিধান রূপে পরিণত হয় নি? অতীতের “ইয়াসিক” এর ন্যায় বর্তমানের এই “তথাকথিত সংবিধানকে” কি তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহর উপর স্থান দিচ্ছে না?

সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কাজ করে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাতের দিকে ফিরে আসে, এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা কম কিংবা বেশী কিছুমাত্রও ফায়সালা করে না।

১। খ) শাসকের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী দেখা গেলে করণীয় সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের ইজমাঃ

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

অর্থাৎ, "রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাকে বাইয়াত দিলাম। তিনি তখন আমাদের থেকে যে বাইয়াত নেন, তার মধ্যে ছিল – 'আমরা শুনবো ও মানবো, আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও যোগ্য ব্যক্তির সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না।' তিনি বলেন, যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।'" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সলফে সালেহীনগণ, মুজতাহিদ ইমামগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোন মুসলিম এলাকার শাসকের মধ্যে এই রকম সুস্পষ্ট কুফরী বা কুফরুন বাওয়াহ দেখা গেলে, তাকে হটিয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক (যিনি এসব কুফরী করবেন না বরং ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী শাসন করবেন) নিয়োগ দেয়া ঐ এলাকার সামর্থ্যবানদের উপর ফরজে আইন। আর সেই শাসকের সমর্থনে যদি কোন বাহিনী থাকে তবে ঐ বাহিনীসহ ঐ শাসককে হটানো হচ্ছে ফরজে আইন।

এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন,

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه

"কাযী ইয়াজ (রঃ) বলেন, 'এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, কাফিরের হাতে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না; সুতরাং তার থেকে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে অপসারণ করতে হবে।'" ..... কাযী ইয়াজ (রঃ) আরো বলেন, "সুতরাং তার থেকে কোন কুফরী বা শরীয়াহ পরিবর্তন বা বিদয়াত প্রকাশ পেলে, সে তার দায়িত্ব থেকে খারিজ হয়ে গেল এবং তার আনুগত্যের অধিকার সে হারালো; আর এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব যে, তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, তাকে অপসারণ করবে এবং একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক নিয়োগ করবে যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একদল মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এটি সম্ভব না হয় তবে ঐ দলটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ঐ কাফিরকে অপসারণ করতে হবে। তবে বিদ'আতীর ক্ষেত্রে সক্ষমতার প্রবল ধারণা হলেই এটি আবশ্যক। অতএব যদি সত্যিই অক্ষমতা বিরাজ করে তাহলে বিদ্রোহ করা আবশ্যক নয়, তবে মুসলমানদেরকে ঐ এলাকা থেকে অন্য কোথাও তাদের দ্বীন নিয়ে হিজরত করতে হবে।" (সহীহ মুসলিম বি শারহুন নববী, কিতাবুল ইমারাহ ১২/২২৮)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেছেনঃ

وقال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

দাউদী (রঃ) বলেছেন, আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম হলে যদি সামর্থ থাকে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করার তাহলে তা ওয়াজিব। তা না হলে ধৈর্য্য ধরা ওয়াজিব। অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও বিদয়াতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে এবং পরে বিদয়াত ও জুলুম করে তবে তার অপসারণ ও বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা যতক্ষণ না সে কুফরী করে। কুফরী করলে তাকে অপসারণ ও তার বিরুদ্ধাচারণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০)

একই ইজমা ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ এ ব্যাপারে ইবনে বাত্তাল (রঃ), ইবনে তীন (রঃ), দাউদী (রঃ) প্রমুখও ইজমা উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার (রঃ) বলেনঃ

وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا " فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

“আর এ ব্যাপারে ইজমার সারমর্ম হলো তাকে তার কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানকে এই উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়াতে হবে, যার এই কাজ করার শক্তি আছে তার জন্য রয়েছে সওয়াব, যে এটা অবহেলা করবে সে গুনাহগার হবে, আর যে এতে অসমর্থ তার জন্য ওয়াজিব হবে ঐ এলাকা থেকে হিজরত করা।” (ফাতহুল বারী, কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩)

আমাদের পরিস্থিতিঃ

অন্যান্য বেশীরভাগ মুসলিম দেশের মতোই বাংলাদেশের মুসলিম নামধারী শাসকরাঃ

– যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের উপর মানবরচিত কুফরী-শিরকী আইন চাপিয়ে রেখেছে।

– আল্লাহ মদ হারাম করেছেন আর এই শাসকগুলো মদের লাইসেন্স দিচ্ছে, মদ বিক্রির অনুমতি দিচ্ছে।

– আল্লাহ স্বিনা হারাম করেছেন আর এরা পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স দিচ্ছে।

– আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন, সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আর এরা সুদের ভিত্তিতে পুরো অর্থনীতি পরিচালনা করছে। সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক পরিচালনার লাইসেন্স দিচ্ছে।

– এরা মানবরচিত কুফরী আইনকে বলছে ‘যুগ উপযোগী আইন’ আর ইসলামী শরীয়াতকে বলছে ‘মধ্যযুগীয় শাসন’।

– এরা পর্দা, দাঁড়ি, টুপিসহ পুরো দ্বীন ইসলামকে নিয়ে প্রতিনিয়ত হাসি-তামাশা করছে।

– এরা নাস্তিক-মুর্তাদ সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, ব্লগারদেরকে ‘বাক-স্বাধীনতার’ নামে আল্লাহ, তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যা ইচ্ছা বলার সুযোগ দিচ্ছে। এদেরকে রক্ষা করে এদের কুফরীতে সাহায্য করছে।

– এরা যুদ্ধরত কাফিরদেরকে সমুদ্রপথ, আকাশ সীমা, বিমান বন্দর ইত্যাদি ব্যবহার করতে দিয়ে, গোয়েন্দাবৃত্তি করে মুসলমান-মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করছে। (২০০১ সালে আগ্রাসী আমেরিকাকে আফগানিস্তানের মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে এদেশের আকাশ-সীমা ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়েছে)

– এরা সংসদ ভবনে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী নিত্য নতুন কুফরী আইন প্রণয়ণ করছে।

– এরা মহিলাদের হিজাব করতে বাধ্য করা যাবে না – এ আইন করেছে।

– এরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে নারী ও পুরুষদের সমান গণ্য করতে চাপ দিচ্ছে।

– এরা যে কোন ইসলামী বইকে বলছে 'জংগী বই'।

– এরা ইসলামের গুরুত্বপূর্ন ফরজ বিধান জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে 'সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ' বলে নিষিদ্ধ করে জিহাদের বিরোধিতা করছে।

– এরা মুরতাদের শাস্তি হত্যাকে তাদের কুফরী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে এর বিপরীতে অবস্থান গ্রহন করেছে।

– এরা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত হুদূদ এর বিধানকে নিজেদের উদ্ভাবিত আইন-বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে যেন আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক উপযোগী আইন-বিধান দাতা হিসেবে নিজেদেরকে তারা জাহির করতে চাচ্ছে।

এভাবে তারা আরো অনেক সুস্পষ্ট কুফরী (কুফরুন বাওয়াহ) প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে।

১। গ) গণতন্ত্র সম্পর্কে পূর্বসূরী ও বর্তমান আকাবীরদের অভিমতঃ

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামক গ্রন্থে 'সিয়াসাতুল মাদীনা' নামক অধ্যায়ে লেখেন-

"যেহেতু ভিড়ের নাম হল শহর, এ জন্য তাদের সবার রায় সুন্নাত হেফাযতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব"।

বুঝা গেল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের একমত হয়ার মুখাপেক্ষী, এতে ইসলাম ও মুসলমানদের কামিয়াবী প্রতিষ্ঠিত করা ধোঁকা ছাড়া কিছুই না।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহঃ বলেন-

"মোটকথা, ইসলামে গণতান্ত্রিক শাসন বলে কোন বস্তু নেই.... এই অভিনব গণতন্ত্র শুধু মনগড়া ধোঁকা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক শাসন, যা মুসলিম ও কাফের সদস্য দিয়ে গঠিত। একে অমুসলিম শাসনই বলা হবে"। [1]

মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহঃ বলেন-

"ওরা বলে থাকে যে, এটা মজদুর ও সাধারণ মানুষদের হুকুমত। এমন হুকুমত নিঃসন্দেহে কাফিরদের হুকুমত"। [2]

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহঃ ইসলামী গণতন্ত্রের পরিকল্পনা রদ করে বলেন–

"গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক আছে? এবং ইসলামী খিলাফতের সাথেই বা কি সম্পর্ক আছে? বর্তমান গণতন্ত্র তো সপ্তদশ শতাব্দীর পরে সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীকের গণতন্ত্রও বর্তমান গণতন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন ছিল। সুতরাং ইসলামী গণতন্ত্র একটি অর্থহীন পরিভাষা। .....গণতন্ত্র একটি বিশেষ কৃষ্টি ও ইতিহাসের ফলাফল। একে ইসলামের ইতিহাসে অনুসন্ধান করাই অনর্থক"। [3]

কারী তায়্যিব সাহেব রহঃ বলেন-

"গণতন্ত্র আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বের মধ্যেও শির্ক এবং আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যেও শির্ক"। [4]

মুফতি রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রহঃ বলেন-

"এইসব বুঝ পশ্চিমা গণতন্ত্রের খবীস বৃক্ষের ফসল। ইসলামে এই কুফরী ব্যবস্থাপনার কোন অবকাশ নাই"। [5]

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী শহীদ রহঃ বলেন-

"গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই শুধু এ-ই নয় বরং গণতন্ত্র ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিপরীত"। [6]

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী শহীদ রহঃ এর কিতাব, 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' এর মধ্যে এই মাসআলাও উল্লেখ আছে-

প্রশ্নঃ হারামকে ইচ্ছে করে হালাল বলা বরং ইসলামী বলা কোন পর্যন্ত নিয়ে যায়? আমি মে ১৯৯১ আমাদের জাতীয় সংসদের অনুমোদিত শরীয়ত বিলের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সেখানে বলা হয়েছে,

শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বয়ান করা হয়েছে, পাকিস্থানে সর্বোচ্চ আইন হবে। তবে শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও হুকুমতের বর্তমান অবকাঠামো যাতে প্রভাবিত না হয়। অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও হুকুমতের বর্তমান অবকাঠামো প্রভাবিত হলে, কুরআন হাদিসকে রদ করে দেওয়া হবে, মানা হবে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও শাসনের অবকাঠামোর ক্ষেত্রে সুপ্রিম 'ল' ১৯৭৩-ই আইন সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওলানা সাহেব! এই বিলের প্রস্তুতকারক, এর অনুমোদনকারী, একে দেশে কার্যকরকারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাহায্যকারী উলামায়ে কেরাম কোন কাতারে অন্তর্ভূক্ত হবেন??

জবাবঃ .... একজন মুসলমানের কাজ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমস্ত বিধিবিধানকে কোন প্রকারের শর্ত ও কাটছাট ছাড়াই মনেপ্রাণে গ্রহন করা। 'আমি কুরআন সুন্নাহকে আইন মানতে পারি তবে শর্ত হল আমার অমুক দুনিয়াবী উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হবে'- এমন কথা ঈমান নয় বরং কট্টর মুনাফেকী। কেমন যেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের সঃ উম্মাত হওয়ার ব্যপারে স্পষ্ট অস্বীকৃতি (কুফরী)। [7]

প্রখ্যাত আলেম মুফতি হামীদুল্লাহ খান দা.বা. বলেন-

"বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে একথা প্রমাণিত যে, বর্তমান গনতন্ত্রই ধর্মহীনতা, নির্লজ্জতা ও সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূল। বিশেষত এই ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সংসদকে হক্কে তাশরীহ (আইন প্রণয়নের অধিকার) প্রদান কুরআন সুন্নাহ ও ইজমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ... আর ভোট পদ্ধতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যত গ্রহন করা এবং তাঁর সমস্ত অনিষ্টের মধ্যে অংশগ্রহণ করার নামান্তর। এজন্য বর্তমান পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ভোট গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয"। [8] ***

মাওলানা সাইয়েদ আতাউল মুহসিন বুখারী রহঃ বলেন-

"যদি কোন কবরকে মুশকিল আসানকারী মনে করা শির্ক হয়, তাহলে অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ইম্পেরিয়েলিজম, ডেমোক্রেসি, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম এবং অন্যান্য বাতিল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মান্য করা ইসলাম হয় কিভাবে? ... কবর সিজদাকারী মুশরিক, পাথর নুড়ি ও বৃক্ষকে মুশকিল আসানকারী মনে করে যে, সে মুশরিক। অথচ গাইরুল্লাহর ব্যবস্থাপনা- বিধিবিধান সংকলন করা, সেটার জন্যে পরিশ্রম করা, সেটা গ্রহণ করা কি তাওহীদ??

ইসলামে গণতন্ত্র কোথায়? ইসলামে না ভোট আছে? না (বাতিল মতবাদের সাথে) সমঝোতা আছে? এগুলো বরদাশতও করা হয় না, এগুলো কৃষ্টিও বরদাশত করা হয় না। ইসলাম আপনার কাছে আল্লাহর বিধানের কাছে আনুগত্য চায়, (বিধানের ব্যপারে) আপনার কাছে ভোট চায় না, আপনার মতামতও চায় না"। [9]

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হাকীম আখতার সাহেব রহঃ বলেন-

'যেদিকে ভোট বেশি সেদিকে যাও'- ইসলামে এমন গণতন্ত্র বলতে কিছুই নেই। বরং ইসলামের কামালত হচ্ছে এই যে, সারা দুনিয়া এক দিকে যাবে, কিন্তু মুসলমান আল্লাহরই থেকে যাবে। ...

যখন হুযুর সঃ সাফা পাহাড়ে নবুয়তের এলান করেছিলেন, তখন ইলেকশন ও ভোটের ব্যপারে নবীর সঙ্গে কেউ ছিল না। নবীর কাছে শুধু নিজের ভোটই ছিল। কিন্তু হুযুর সঃ কি আল্লাহর বার্তা প্রচার করা থেকে বিরত থেকেছেন?? [10]

মুফতিয়ে আযম দারুল উলুম দেওবন্দ, মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহঃ এর ফাতওয়া–

প্রশ্নঃ আমাদের নবী সঃ কি গণতন্ত্র কায়েম করেছিলেন? আর ৪ খলীফাও কি সেই গণতন্ত্রের উপর চলেছেন নাকি তারা

রদবদল করেছেন??

জবাবঃ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ গণতন্ত্রের নিন্দা করেছেন। সেখানে আইন ও বিধিবিধানের ভিত্তি দলীলের উপর নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপরে। অর্থাৎ মতাধিক্যের ভিত্তিতে ফায়সালা হয়। সুতরাং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায় কুরআন সুন্নাহর খেলাফও হয়, তাহলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ীই ফায়সালা হয়। কুরআনে কারীম সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুগত্যকে পথভ্রষ্টতার নিয়ামক বলা হয়েছে।

(সমাজে) আলেম, সৎ ও বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা কমই থাকে। ৪ খলীফা হুযুর সঃ এর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁর খেলাফ অন্য রাস্তা অবলম্বন করেন নি। [11]

শাইখুল হাদীস মাওলানা সলিমুল্লাহ খান দা.বা. এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক পন্থার অধীনে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব কিনা? উত্তরে তিনি বলেন-

“না; তা সম্ভব না। নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম আনা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। গনতন্ত্রে বিবেচ্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়। আর গরিষ্ঠ সংখ্যা থাকে মূর্খ, যারা দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। তাদের থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না”। [12]

হযরত মুফতি নিযামুদ্দীন শামেযী শহীদ রহঃ বলেন-

“দুনিয়াতে আল্লাহর তাআলার দ্বীন ভোটের মাধ্যমে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা এ দুনিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে আল্লাহর দুশমনদের, ফাসেক ও ফাজেরদের। আর গণতন্ত্র হল মাথা গণনা করার নাম। ওজন করার নাম নয়।

দুনিয়াতে ইসলাম যখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেই এক পন্থায়ই প্রতিষ্ঠিত হবে। যেটা আল্লাহর নবী সঃ অবলম্বন করেছিলেন। তা হল জিহাদের রাস্তা।

আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসন এসেছে। ইসলামী শরীয়ত এসেছে। কখন এসেছে? যখন ১৬ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন, ১০ লক্ষ মানুষ বিকলাঙ্গ হয়েছেন- কারো হাত নেই, কারো চোখ নেই, কারো কান নেই, কারো পা নেই। আল্লাহ তাআলা বিনামূল্যে কাউকে দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী না করা হয়। পাকিস্তানের লোকজন আশা করে যে তালেবানের হুকুমত আসুক অথবা তালেবানের মত হুকুমত আসুক। কিন্তু এর জন্য যে কুরবানী প্রয়োজন তার জন্যে তারা প্রস্তুত নয়”। [13]

রেফারেন্সসমূহঃ

[১] মালফুযাতে থানবী রহঃ, পৃ ২৫২

[২] আকায়েদুল ইসলাম, পৃ ২৩০

[৩] মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮

[৪] ফিররি হুকুমাত, কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব রহঃ

[৫] আহসানুল ফতোয়াঃ ৬/২৬

[৬] আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৮/১৭৬

[৭] হাশিয়া আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ১/৪৯

[৮] মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৩২

[৯] তাওহীদ ও সুন্নাত কনফারেন্সে বক্তৃতা, ২৬ সেপ্টম্বর ১৯৮৭ ইং, বার্মিঙ্ঘাম জামে মসজিদ, বৃটেন।

[১০] ফাযায়েলে মারেফাত ও মহব্বত, ২০৯

[১১] ফতোয়া মাহমুদিয়া, ৪র্থ খন্ড, সিয়াসাত ও হিজরত অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কিত আলোচনা

[১২] মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১

[১৪] মাসিক সানাবিল, করাচি, মে ২০১৩ ইং, খন্ড ৮, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

১। ঘ) শরিয়াহর পরিবর্তে আইন রচনাই কি ইসলাম ত্যাগের জন্য যথেষ্ট? নাকি অন্তর থেকেও অবিশ্বাস জরুরী?

উত্তর প্রদানে – শায়খ সুলাইমান আল 'আল্ওয়ান (আল্লাহ্ তাঁকে সৌদি কারাগার থেকে মুক্তি দান করুন)

প্রশ্নঃ

আমি শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন) কর্তৃক লিখিত বই 'আল ক্বাউল আল মুফীদ ফী শারহু কিতাব আত-তাওহীদ' এ উনার কথা পড়েছি। সেখানে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ এরূপঃ 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা যারা শাসন করে তাদের মনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে এইসব মানবরচিত আইন তাদের দেশের ও দেশের মানুষের জন্য অধিক উপকারী ও আল্লাহর আইন অপেক্ষা শ্রেয়'।

এটা কি সত্য যে, কোন শাসক যদি শরীয়ার কোন আহকামকে প্রতিস্থাপন করেন তাহলে এটাই প্রমাণ হয় যে তিনি মানবরচিত আইনকে আল্লাহর শরীয়াহ অপেক্ষা শ্রেয় মনে করেন? এটা কি তার কুফরের কারণ হবে? নাকি এরূপ কাজ নিজেই একটা কুফর?

উত্তরঃ

সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইজমা, যেমন ভাবে আল হাফীয ইবনে কাসীর তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়া নিহাইয়া' গ্রন্থের ত্রয়োদশ খন্ডে চেঙ্গিস খানের জীবনী অংশে উল্লেখ করেছেন যে, জুহুদ অথবা তাকযীব অথবা তাফসীল অথবা একই রকম অন্য কোন বিষয়ের সাথে তুলনা বা সম্পৃক্ত না করেই বলা যায় যে,

এরূপ কাজ হল নিজেই একটা কুফরী ও রিদ্দাহ।
সুতরাং যখন আমরা দেখি যে কোন ব্যক্তি "আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন করে" তখন এটা হতে পারে যে সে বিশ্বাস করে তার হুকুম আল্লাহর আইন অপেক্ষা উন্নততর কিংবা এটাও হতে পারে যে তার এই কাজের পেছনে বিশেষ কোন বিশ্বাস নেই, সে তা কেবল একটা কাজ হিসেবেই করছে।

সুতরাং সে কি বিশ্বাস করছে সেটা না দেখেই বরং স্বয়ং তার কাজের উপর ভিত্তি করে আমরা তাকফির করবো। যদি তার কাজের সাথে বিশ্বাস জড়িত হয় তাহলে তার কুফর (পরিধি) বৃদ্ধি পাবে।

অন্যথায়, এরূপ কাজ করা নিজেই একটা কুফরী ও দ্বীন থেকে রিদ্দাহ বুঝায়,
যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ
"যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"

তিনি আরও বলেন

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে।"

আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন (যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।) সেই হিসাবে আমরা বলতে চাই-

আল্লাহর আইন ছেড়ে দেয়ার কুফর,

(নিজের মতো) আইন প্রণয়নের কুফর
এবং সেই আইন দিয়ে শাসন করার কুফর-
তারা (যেসব শাসক এরুপ করছে) তিন ধরণের কাজ করছে যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে।
সুতরাং যারা বলে- 'এরুপ শাসকেরা তো অবিশ্বাস করেনা, যদি না তারা পরিপূর্ণ ভাবে বর্জন করে (যেটির সাথে অন্তরের বর্জনও সম্পর্কিত)' তারা ঘুলাত আল জাহমীয়াহ মাযহাবের অংশ বা মুরজিয়া।

১। ঙ) বেরলবী মতবাদ – ভিত্তিহীন আক্বীদা ও ভ্রান্ত ধারনা – *মাওলানা আব্দুল মালেক (দাঃ বাঃ)*

বেরলভী (1) জামাত যাদেরকে রেজাখানী বা রেজভীও বলা হয়, যারা নিজেদেরকে সুন্নী বা আহলে সুন্নাত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের অনেক ভিত্তিহীন আকীদা, ভ্রান্ত ধ্যানধারণা ও মনগড়া রসম-রেওয়ায রয়েছে। খুব সংক্ষেপে তার একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হল।

১. *ভিত্তিহীন আকীদা*

গায়রুল্লাহর জন্য ইলমে গায়েবের আকীদা
আহলে হকের আকীদা হচ্ছে, আলিমুল গাইব অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর জন্য অদৃশ্য বলতে কিছুই নেই। দৃশ্য-অদৃশ্যের পার্থক্য মাখলুকের জন্য। আল্লাহ সমানভাবে আলিমুল গাইব ও আলিমুশ শাহাদাহ। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশ্য। ইলমে যাতী ও ইলমে মুহীত তথা নিজস্ব ও সর্বব্যাপী ইলম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।

আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। তবে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের বহু জ্ঞান দান করেছেন। আর নবীগণের মধ্যে সাইয়েদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, খাতামাতুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাকাম এ বিষয়ে সকলের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ পাক তাঁকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন সমষ্টিগতভাবে অন্য কোনো রাসূলকেও তা দান করা হয়নি। কিন্তু এরপরও এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গাইব ছিলেন বা "ভবিষ্যতে যা হবে ও অতীতে যা হয়েছে সকল বিষয়ে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর সামনে যা ঘটত তা যেমন তিনি জানতেন, দূরের-কাছের অন্য সবকিছুই জানতেন; যা ওহী আসত তা যেমন জানতেন, যা ওহী হত না তাও তেমনি জানতেন"!! কারণ, এ তো হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর বিশেষ সিফাতের মধ্যে শরীক করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ।

কেননা কুরআনে কারীম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই গুণবাচক নাম। তেমনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কিছু আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাননি। কারণ, ঐসব বিষয় তার নবুওত ও রেসালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। যেমন কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো আয়াত বা সূরা তাঁর কাছে ওহীরূপে আসার পূর্বে তা তাঁর জানা ছিল না।

উল্লেখিত সহীহ আকীদার উপর মাওলানা মনযূর নোমানী রাহ. লিখিত 'বাওয়ারিকুল গায়েব'গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে একটি দুটি নয়, চল্লিশটি আয়াতে কারীমা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উপরোক্ত সহীহ আকীদার পক্ষে একশ পঞ্চাশ খানা হাদীস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এই বিষয়ে হযরত মাওলানা সরফরায খান সফদার রাহ.-এর কিতাব 'ইযালাতুর রাইব আন ইলমিল গাইব' তো আলেমদের হাতে আছেই।

উল্লেখিত ঈমানী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত বেরলভীদের আকীদা হচ্ছে- দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছে। একই সাথে অতীতে যা কিছু হয়েছে ও কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সব বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন! সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সামান্যতম বিষয়ও তার জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল না। উক্ত বাতিল আকীদা প্রচারের জন্য স্বয়ং আহমদ রেযা খান একাধিক বই লিখেছে। যেমন 'ইস্বাউল মুস্তফা' ও 'আদ দাওলাতুল মাক্কিয়াহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ'। আরো দেখা যায়, প্রসিদ্ধ বেরলভী আলেম মৌলভী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রচিত 'আলকালিমাতুল উল্যা' পৃ. ৩, ৪৩, ও ৬৩। এবং কাজী ফযল আহমদ লুধিয়ানভী রচিত 'আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত' পৃ. ১৩৭

২. *হাযির-নাযির শীর্ষক আকীদা*

পরিভাষায় হাযির-নাযির ঐ সত্তাকে বলে যার শক্তি ও জ্ঞান সর্বাবস্থায় সকল স্থানকে বেষ্টন করে আছে। কোনো কিছু তাঁর ইলম ও কুদরতের বাইরে নয়। তিনি সকল কিছু দেখেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না। এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা । এটি অতি স্পষ্ট ও অকাট্য এবং কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে উল্লেখিত অর্থে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হাযির-নাযির মনে করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও শিরকী আকীদা। এই আকীদার ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতা বোঝার জন্য দেখা যেতে পারে মাওলানা সরফরায খান লিখিত কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহের এক উত্তম সংকলন 'তাবরীদুন নাওয়াযির ফী তাহকীকিল হাযির ওয়ান নাযির'।

কিন্তু আফসোস, বেরলভীরা উল্লেখিত শিরকী আকীদার প্রবক্তা। তারা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নয়, বুযুর্গানে দ্বীনকেও হাযির-নাযির মানে।

মশহুর বেরলভী আলেম আহমদ ইয়ার খান লিখেন,

عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی ی٥ ہے ک٥ قوت قدسی٥ والا ایک ٥ی جگ٥ ر٥ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کو سیر کرے اور صد٥ا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے، ی٥ رفتار خوا٥ صرف روحانی ٥و یا جسم مثالی کے سات٥ھ ٥و یا ایسی جسم سے ٥و جو قبر میں مدفون ١٥و یا کسی جگ٥ موجود ہے ان سب معنے کا ثبوت بزرگان دین کے لئے قرآن و احادیث اور اقوال علماء سے ہے. (جاء الحق ج ١ ص ١٣١)

অর্থাৎ, জগতে হাযির-নাযির থাকার শরয়ী অর্থ হচ্ছে, পবিত্র শক্তির অধিকারী কোনো সত্তা একই স্থানে অবস্থান করে সমস্ত দুনিয়াকে নিজের হাতের তালুর মত দেখেন। দূরের ও কাছের সমস্ত আওয়ায শোনেন। আবার মুহূর্তের মাঝে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারেন। শত শত মাইল দূর থেকে প্রয়োজনগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করেন। এ ভ্রমণ শুধু রুহানীভাবে হোক অথবা মিছালী দেহের সাথে, অথবা এমন দেহের সাথে যা কোনো কবরে সমাহিত বা কোনো স্থানে মওজুদ।
হাযির-নাযিরের উল্লেখিত অর্থ কুরআন হাদীস ও উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে বুযুর্গানে দ্বীনের জন্য প্রমাণিত। (জা-আল্ হক, আহমদ ইয়ার খান, খ. ১ পৃ. ১৩১)

সম্মানিত পাঠক লক্ষ করুন, উল্লেখিত ভ্রান্ত আকীদাকে কীভাবে কুরআন হাদীস ও উলামায়ে কেরামের উক্তির উপর আরোপ করে দেওয়া হল,سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

৩. *মোখতারে কুল শীর্ষক আকীদা*

ইসলামের সুস্পষ্ট ও সর্বজন বিদিত একটি আকীদা, যার পক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদী ছাড়াও অনেক আয়াত ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, তা এই যে, সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর মালিক-মোখতার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কিন্তু বেরলভী জামাতের আকীদা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোখতারে কুল মনে করে।

আহমদ রেযা খান লিখেছেন,

حضور ٥ر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ٥یں، دنیا و آخرت کی مرادیں سب حضور کے اختیار میں ٥یں. (برکات الإمداد لأهل الاستمداد ص ٨٥)

অর্থাৎ হুযুর সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। দুনিয়া-আখিরাতের সকল মকসুদ ও উদ্দেশ্য তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। -বারাকাতুল ইমদাদ লিআহলিল ইসতিমদাদ, আহমদ রেযা খান পৃ. ৮

আরো বলেছেন-

رب العزۃ جل جلالہ نے اپنے کرم کے خزانے اپنی نعمتوں کے خوان حضور کے قبضے میں دئے جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں ، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے، کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلے اللہ علیہ و سلم (ملفوظات ج ৪ ص ৭০-৭১)

অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী প্রভু আপন দানের ভা-ার নিআমতের খাযানা হুযুরের কব্জায় দিয়ে দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দিবেন যাকে ইচ্ছা দিবেন না। সমস্ত ফায়সালা কার্যকর হয় একমাত্র হুযুরের দরবার থেকেই। আর যে কেউ যখনই কোনো নিআমত কোনো দৌলত পায় তা পায় হুযুরের রাজ-ফরমান থেকেই। -মালফুজাত, আহমদ রেযা খান খ. ৪ পৃ. ৭০-৭১

আহমদ রেযা খান সাহেবের উপরোক্ত বাক্যগুলো পড়ুন, এরপর কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহের উপর চিন্তা করুন। দেখুন কুরআন কী বলে আর আহমদ রেযা খান সাহেব কী বলেন!

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّیْ وَ لَآ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا.

বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন, আমি মালিক নই তোমাদের ক্ষতি সাধনের আর না সুপথে আনয়নের। বলে দাও, আল্লাহ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আর আমিও তাকে ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। অবশ্য (আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা হল) আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। -সূরা জিন (৭২) : ২০-২৩

২. قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ.

বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর ভা-ারসমূহ। -সূরা আনআম (৬) : ৫০

৩. قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْٓءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ وَّبَشِیْرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ.

বলুন, আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মালিক নই; কিন্তু আল্লাহ যা চান। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে প্রচুর ভাল-ভাল জিনিস নিয়ে নিতাম এবং কোনো কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা- যারা আমার কথা মানে তাদের জন্য। -সূরা আরাফ (৭) : ১৮৮

৪. اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ.

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীগণকে। -সূরা কাসাস (২৮) : ৫৬

বেরলভী জামাত শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নয়, অনেক বুযুর্গানে দ্বীনকেও মোখতারে কুল ও কুন ফায়াকুনের অধিকারী মনে করে। এ প্রসঙ্গে আহমদ রেযা খানের পুত্র মুস্তফা রেযা খান লেখেন-

اولیاء میں ایک مرتبہ ہے التکوین کا جو چیز جس وقت چاہتے ہیں فورا ہو جا تی ہے ، جسے کن کہا وہی ہو گیا (شرح

استمداد ص ২৮)

অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামের একটি মাকাম হচ্ছে আসহাবে 'তাকভীন'গণের মাকাম। তারা যখন যা ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়। যে সম্পর্কেই 'কুন' 'হও' বলেন তা-ই হয়ে যায়। -শরহে ইসতিমদাদ পৃ. ২৮

বরং খোদ আহমদ রেযা খান শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহ. সম্পর্কে লিখেছেন-

ذی تصرف بﷲی ، ماذون بﷲی، مختار بﷲی

کار عالم کا مدبر بﷲی عبد القادر

অর্থাৎ শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। অনুমতি প্রাপ্ত ও ইচ্ছা-ইখতিয়ারের অধিকারী এবং জগতের কার্যাবলীর পরিচালকও। -হাদায়েকে বখশিশ, আহমদ রেযা খান ১ : ২৭

বেরলভী জামাত যেহেতু গায়রুল্লাহকে মোখতারে কুল তথা সর্বক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাই গায়রুল্লাহকে প্রয়োজন পূরণকারী ও বিপদ-আপদ বিদূরণকারী বলেও বিশ্বাস করে, তাই তারা উপায় উপকরণের ঊর্ধ্বের বিষয়েও মৃত ও জীবিত বুযুর্গদের কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করাকে জায়েয মনে করে, যা "إياك نستعين"-এর মধ্যে ঘোষিত 'তাওহীদুল ইসতিআনাহ'-এর পরিপন্থী স্পষ্ট শির্ক। তাদের এই শিরকী আকীদার উল্লেখ আহমদ রেযা খানের 'আল আমনু ওয়াল উলা' (الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء) এবং মুস্তফা রেযা খানের 'শরহে ইসতিমদাদ' ইত্যাদি বইপত্রে রয়েছে।

৪. *নূর-বাশার শীর্ষক আকীদা*

কুরআনে কারীমের ঘোষণা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা এই যে, আল্লাহর রাসূল বাশার তথা মানব ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন সাইয়েদুল বাশার মানবকুল শিরোমণি। আল্লাহ পাক তাঁকে হেদায়েতের নূর ও 'সিরাজুম মুনীর' রূপে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু বেরলভী জনসাধারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবসত্তার অস্বীকারকারী। তাদের আকীদা- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাকে নূর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, যা কুরআন-হাদীসের ঘোষণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

এ সম্পর্কে সহীহ আকীদ জানতে দেখুন :

মাওলানা সরফরায খান রচিত 'নূর ও বাশার'। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী কৃত 'বাশারিয়্যাতে আম্বিয়া কুরআন মাজীদ মে', সাইয়েদ লাল শাহ বুখারীর 'বাশারিয়্যাতে রাসূল' ও মাওলানা মতিউর রহমানের 'প্রচলিত জাল হাদীস'।

৫. *কবর পূজা ও অন্যান্য শির্ক*

বেরলভী জনসাধারণের একটি বড় অংশ মাজার পূজারী। বেরলভী সম্প্রদায়ের আলেমরা তাদের জনসাধারণকে যখন এই সবক দিয়েছে যে, প্রত্যেক বুযুর্গই হাযির-নাযির । মোখতারে কুল। হাজত পূরণকারী ও বিপদাপদ বিদূরণকারী। তখন তারা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ও বালা মসিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের কবরে তাওয়াফ ও সেজদা২[2] কবরওয়ালার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ, তাদের নাম জপা, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত মানা, এবং গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু কুরবানীর মতো প্রকাশ্য শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে।

উল্লেখিত কর্মগুলো শিরক হওয়া দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের প্রমাণাদী জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :

মাওলানা মনযুর নোমানী রাহ. লিখিত ‘কুরআন আপসে কিয়া কাহতা হ্যায়’ ও ‘দ্বীন ও শরীয়ত’। মাওলানা সরফরায খান লিখিত ‘ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দি তাউযীহুল বয়ান’ ও ‘রাহে সুন্নাত’। এই অধম লিখিত ‘তাসাউফ তত্ব ও বিশ্লেষণ’

ভ্রান্ত ধ্যানধারণা

উল্লেখিত ভিত্তিহীন আকীদাগুলো ছাড়াও যে সকল ভ্রান্ত ধারণার উপর বেরলভী চিন্তা-ঘরানার ভিত্তি তন্মধ্যে শুধু একটি মৌলিক ভ্রান্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে বিদআতের সংজ্ঞার তাহরীফ ও বিকৃতি। এই বিকৃতি সাধনের কারণে বেরলভী জামাতের আলেমগণ বিদআত ও কুসংস্কারের পক্ষের দলে পরিণত হয়েছেন।

খায়রুল কুরুন তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের সোনালী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদআতের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, শরঈ দলীল-প্রমাণ দ্বারা যে বিষয়টি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণিত নয় এমন কিছুকে দ্বীনের হুকুম মনে করে করার নামই বিদআত। বিষয়টি আকাইদ সংক্রান্ত হোক বা ইবাদত সংক্রান্ত, অথবা ইবাদতের সময় ও পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক, কিংবা তা হোক দ্বীনের অন্য কোনো শাখার সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়। (দ্র. আল ই‘তিসাম, শাতেবী; আল মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ; মেরকাত, মোল্লা আলী কারী; রাহে সুন্নাত, সরফরায খান; মুতালাআয়ে বেরলভিয়্যাত, খালেদ মাহমুদ; ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী)

কিন্তু আহমদ রেযা খান ও তার সহযোগী মৌলভীরা এই সংজ্ঞা এভাবে বিকৃত করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আকীদা, ইবাদাত অথবা ইবাদাতের বিশেষ কোনো পদ্ধতি নিষিদ্ধ হওয়ার উপর কোনো আয়াত বা হাদীস না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এমন বিষয়কে দ্বীনের হুকুম সাব্যস্ত করতে অসুবিধা নেই। এবং এটাকে বিদআত বলারও অবকাশ নেই।

[আল আমনু ওয়াল উলা, আহমদ রেযা খান, পৃ. ১৫৭-১৫৮; জা-আল হক, মুফতী আহমাদ ইয়ার খান খ. ১ পৃ. ২৩০, ২৫৩, ২৫৪; ইশতেহারে আতইয়াব, মুফতী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী পৃ. ১৯ (মুতালাআয়ে বেরলভিয়্যাত খ. ৩ পৃ. ২১৫-৩৩৮-এর মাধ্যমে)]

অথচ যা কিছু নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আয়াত বা হাদীস থাকবে তা তো হারাম বা মাকরূহে তাহরিমী হবে। বিদআত তো নিষিদ্ধ এই জন্য যে শরঈ দলীল ছাড়া একে শরীয়তের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে । বেরলভী সম্প্রদায় বিদআতের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা সরাসরি হাদীসের খেলাফ। হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থাৎ যে কেউ দ্বীন নয় এমন কিছুকে আমাদের এই দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করলে তা পরিত্যাজ্য। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭১৮

বিদআত ও কুসংস্কারের পক্ষপাত

বেরলভী উলামা মাশায়েখের প্রধান কীর্তি সম্ভবত এটাই যে, তারা দ্বীনের বিষয়ে এই নতুন নিয়ম উদ্ভাবনের মাধ্যমে (অর্থাৎ কোনো কিছু বিদআত বলার জন্য তার নিষিদ্ধতার উপর স্বতন্ত্র আয়াত বা হাদীস থাকা চাই), শরঈ প্রমাণাদীর তাহরীফ ও বিকৃতির মাধ্যমে, শরঈ উসূল ও মৌলনীতিকে পদদলিত করে এবং ভিত্তিহীন ও অবাস্তব কিছু বর্ণনার আশ্রয় নিয়ে সমাজে প্রচলিত বিদআত রসম-রেওয়ায এবং মুনকার ও গর্হিত কর্মকাণ্ডের পক্ষে জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং এগুলোকে ইলমী সনদ দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

যে সমস্ত বিদআতকে তারা মুবাহ-মুসতাহসান বলে সমাজে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে নিম্নে নমুনাস্বরূপ কিছু বিষয় তুলে ধরা হল।

১. *ঈদে মিলাদুন্নবী নামে ইসলামে নতুন ঈদের আবিষ্কার।*

২. *রসমী মিলাদকেই দ্বীন মনে করা।*

৩. *উরস করা।*

৪. *মাজার পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা।*

৫. *কবরে বাতি জ্বালানো।*

৬. *কবরের উপর চাদর বিছানো ও ফুল ছড়ানো।*

৭. *মাযারে এক ধরনের মু'তাকিফ বনে থাকা।*

৮. *জানাযার পরে দুআর রসম।*

৯. *কবরের উপরে আযান দেওয়ার রসম।*

১০. *আযান ও ইকামতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে উভয় চোখে লাগানো।*

১১. *ঈসালে সাওয়াবের জন্য কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা।*

১২. *খাবার সামনে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ফাতেহা পড়ার রসম।*

১৩. *আযানের পূর্বে দুরূদ ও সালামের রসম।*

বেরলভী উলামা ও মাশায়েখের কিতাবাদী উল্লেখিত বেদআতসমূহের পক্ষপাতপূর্ণ। এর অধিকাংশ বিষয়ের উল্লেখ তো তাদের প্রসিদ্ধ বই 'জা-আল হকে' রয়েছে। এ ছাড়াও মৌলভী আব্দুস সামী' সাহেবের লেখা 'আনওয়ারে সাতেআ'ও দেখা যেতে পারে। আর ঐ সমস্ত বিষয় বিদআত হওয়ার প্রমাণাদী জানতে চাইলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবাদী দেখুন। উদাহরণস্বরূপঃ

১. *আল জুন্নাহ্ লি আহলিস সুন্নাহ, মুফতী আব্দুল গণি, সাবেক ছদরে মুদাররিস, মাদারাসায়ে আমিনীয়া দিল্লী।*

২. *বারাহীনে কাতিআহ, মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী।*

৩. *ইসলাহুর রুসূম, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী।*

৪. *রাহে সুন্নাত, মাওলানা সরফরায খান।*

৫. *ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবী।*

আকাবিরে দ্বীনকে কাফের আখ্যা দেওয়া এবং মুসলমানদের মাঝে বিভেদ-বিভক্তির অপপ্রয়াস

আহমদ রেযা খান বেরলভী সাহেব যে ঘৃণ্য কাজগুলো করেছেন সেগুলোর অন্যতম হল, আকাবিরে উম্মতকে কাফের আখ্যায়িত করা। মুসলমানদের বিভক্ত করার এবং না জানি আরো কী কী ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে আকাবিরে উম্মতকে কাফের আখ্যা দেওয়ার তার প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এটি তার জীবনের অতি স্পষ্ট ব্যস্ততা ছিলো।

সুতরাং কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে নয়, বরং জেনে শুনে নিতান্তই হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রাহ., মাওলানা কাসেম নানুতবী রাহ., মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. প্রমুখ আকাবিরে উম্মতকে কাফের আখ্যায়িত করেন। এই সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের জীবনে তো কুফুরীর গন্ধ আসে এরূপ কোনো কিছুই ছিল না। এরপরও কীভাবে তিনি এমন ব্যক্তিদের কাফের বলতে পারেন?

তাকে এর জন্য মিথ্যাচার ও বিকৃতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। আকাবিরে উম্মতের কথাগুলো কাটছাঁট করে, নিজের পক্ষ থেকে কুফুরী বাক্য বানিয়ে তাদের সাথে সম্বন্ধ করে 'হুসামুল হারামাইন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে, যার প্রতিবাদে আকাবিরে দ্বীন 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং খান সাহেবের মিথ্যাচার ও বিকৃতিসমূহ উন্মোচিত করে দেন।

আল্লামা খালেদ মাহমুদ সাহেবের লেখা 'ইবারতে আকাবির', মাওলানা সরফরায খানের 'ইবারতে আকাবির', মাওলানা মনযুর নোমানীর 'মারেকাতুল কলম' বা 'ফায়সাল কুন মুনাযারা'। মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরীর অনেকগুলো পুস্তিকা ও হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী রাহ.-এর 'বাসতুল বানান' ও 'তাগয়িরুল উনওয়ান' প্রভৃতি কিতাব এ প্রসঙ্গে লিখিত। যেগুলোতে খান বেরলভীর তাকফীরী কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা অত্যন্ত ইল্ম ও ইনসাফ ভিত্তিক করা হয়েছে এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আকাবিরে উম্মতকে কাফের বলার ক্ষেত্রে আহমদ রেযা খান ছিলেন মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী ও বিকৃতি সাধনকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এখনও বেরলভী জনসাধারণ আকাবিরে উম্মতকে কাফের বলে নিজেদের দ্বীন ঈমান বরবাদ করছে।

এ সংক্ষিপ্ত তালিকায় কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করা হল। বেরলভী মতবাদ সম্পর্কে আরো অধিক জানতে হলে পড়তে পারেন ডা. খালেদ মাহমুদ লিখিত 'মুতালাআয়ে বেরলভিয়্যাত' যা অনেক আগেই ছেপে এসেছে। এ গ্রন্থটি বেরলভী মতবাদ সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষ যা ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ সমৃদ্ধ।

আর زلزله বইয়ের মিথ্যা অপবাদসমূহের স্বরূপ জানার জন্য পড়ুন : মাওলানা মুহাম্মাদ আরেফ সাম্ভলী নদভী কৃত

بريلوي فتنہ کا نیا روپ

উল্লেখ্য, বেরলভী ঘরানার কোনো কোনো আলেম এসব শিরক ও বিদআতের অনেক কিছুরই প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু বেরলভী জনসাধারণের উপর তাদের বিশেষ কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। কত ভালো হত যদি অন্যান্য বেরলভী আলেমগণও এ আলেমগণের সমর্থন করতেন এবং তাদের চিন্তাগুলো প্রচার করার চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে আমরা পাকিস্তানের বেরলভী ঘরানার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নাঈমিয়া করাচীর শাইখুল হাদীস আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদীর কথা উল্লেখ করতে পারি। তার কিতাব শরহে সহীহ মুসলিম সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি 'ইলমে গাইব', 'নূর ও বাশার', 'গায়রুল্লাহর জন্য মান্নত' ইত্যাদি বিষয়ে বেরলভীদের মাঝে প্রচলিত ধ্যানধারণার বিপরীত মতামতকেই দলীলসহ সমর্থন করেছেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

০৩/০১/১৪২৫ হি.

[এটি আমার পুরনো একটি লেখা। মনে নেই এর প্রেক্ষাপট কী ছিল। হঠাৎ হাতের কাছে পেয়ে সময়-উপযোগী মনে হওয়ায় এখন আলকাউসারে ছাপা হচ্ছে।

-আবদুল মালেক

১৮. ১০. ১৪৩৭ হি.]

টীকাঃ

(1) ইমাম মুজাহিদ হযরত মাওলানা সায়্যেদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (জন্ম ১২০১ হি.- শাহাদত ১২৪৬ হি.) রায়বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তিনিও 'বেরলভী'বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আহমদ রেযা খান সাহেব (জন্ম: ১২৭২ হি. মোতাবেক ১৮৫৬ খৃ. মৃত্যু: ১৩৪০ হি. মোতাবেক ১৯২১ খৃ.) রায়বেরেলীর নয় বরং 'বেরেলীর'অধিবাসী ছিলেন। তাকে বেরলভী বলা হয় বেরেলী এলাকার হিসেবে। বেরলভী জামাত তারই অনুসারী। *(আবদুল মালেক)*

(2) গায়রুল্লাহর জন্য 'সিজদায়ে তাহিয়্যা' বা সম্মানের সেজদা হারাম হওয়ার বিষয়ে আহমদ রেযা খান সাহেবের স্বতন্ত্র পুস্তিকা রয়েছে। যার নাম الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية কিন্তু এ পুস্তিকার কোনো প্রভাব মাযারপন্থী বেরলভীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় না।

নিফাক

২। নিফাকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদঃ

লেখকঃ *সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান*

বিস্তারিত দেখুনঃ

https://bit.ly/2MRBMWF

আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা

৩। ক) যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে শাইখুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর ফতোয়াঃ

فتاوي الأئمة في براءة الكفرة

شيخ العرب والعجم مولانا حسين احمد مدنى رحمہ اللہ کا فتوی

قتل مسلم کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ مل کر ان کی فتح و نصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی اعانت کرے اور جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہو تو کافروں کا ساتھ دے-یہ صورت اس جرم کے کفرو عدوان کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایسی اشد حالت ہے جس سے زیادہ کفر اور کافری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا- دنیا کے وہ سارے گناہ، ساری معصیتیں، ساری ناپاکیاں،ہر قسم کی نافرمانیاں جو ایک مسلمان اس دنیا میں کر سکتا ہے یا ان کا وقوع دھیان میں آ سکتا ہے سب اس کے آگے ہیچ ہیں- جو مسلمان اس کا مرتکب ہو وہ قطعا کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے- اس نے صرف قتل مسلم کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اسلام کے برخلاف دشمنان حق کی اطاعت و نصرت کی ہے- اور یہ بالاتفاق اور بالاجماع کفر صریح ہے-جب شریعت ایسی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا علاقہ محبت رکھنا بھی جائز نہیں رکھتی تو پھر صریح اعانت فی الحرب کے بعد کیونکر ایمان و اسلام باقی رہ سکتا ہے

[قتل مسلم ،کتاب: معارف مدنی افادات مولانا حسین احمد مدنی]

جمع و ترتیب:مفتی عبدالشکور ترمذی

যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে শাইখুল আরব ওয়াল আজম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) এর ফতোয়া

মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায়।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত অপরাধটি কুফরি ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে মারাত্মক কুফর ও কুফরী কর্মকাণ্ড কল্পনাও করা যায়না।

বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা – এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ।

যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।

সে শুধু মুসলমান হত্যায় জড়িত হয়েছে এটুকুই নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে হক্ব এর শত্রুদের আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং এটি সকলের ঐক্যমতে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরে ছরীহ – সুস্পস্ট কুফর।

এমতাবস্থায় শরীয়ত যেখানে অমুসলিমদের সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সম্পর্কেরও বৈধতা দেয়না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে?

অধ্যায়ঃ কতলে মুসলিম; মাআ'রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)
সংকলন ও বিন্যাসঃ- মুফতী আব্দুস সাকুর তিরমিজী।

৩। খ) আমি এমন বাবার সাথে কেমন আচরণ করবো যে তাগুতের নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকুরি করে?

প্রশ্নঃ *আমার বাবা তাগুতের নিরাপত্তা বাহিনীতে চাকুরি করেন। শুরুতে তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড হিসাবে কর্মরত ছিলেন কিন্তু পরে জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। সেখানে তিনি জঙ্গিবাদ বিরোধী স্কোয়াডে কাজ করছিলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি এমন এক দলে যোগ দান করেন যারা মাদক সংক্রান্ত অপরাধ, হত্যা এবং চুরি-ডাকাতি নির্মূলে কাজ করছিল।*

যদিও আমার বাবা কখনও হিজাব পড়তে নিষেধ করেননি, তবুও তিনি নেকাব করতে কড়াভাবে নিষেধ করতেন। তিনি সালাফিদের বিশেষত যারা নিজেদের জিহাদী সালাফি পরিচয় দেন তাদেরকে অপছন্দ করেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকে জঙ্গি সংগঠন বিবেচনা করেন। এই ধরনের যুবকদেরকে তিনি মুজাহিদীন হিসাবে তো নয়ই এমনকি মুসলিম হিসাবেও গন্য করেন না।

বরং বাস্তবতা হল তিনি তাদেরকে জঙ্গি বলেন এবং তিনি সবসময়ই দাড়িওয়ালা লোক এবং হিজাব পড়া মহিলাদের কটাক্ষ করেন। তিনি নামাজ পড়েন না এবং রাগের মাথায় মহাপরাক্রমশালি আল্লাহকেও ব্যাঙ্গ করেন।

আমি এই বিষয়গুলোতে উনার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে খুবই অনড় এবং আমার কথাও শুনেন না।

এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে আমি আমার বাবার সাথে আচরণ করবো বিশেষত যখন কিছু বোনেরা আমাকে তার থেকে এবং তার কাজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিচ্ছেন?

কিন্তু এই ব্যক্তিই প্রতি মাসে আমার ভরণ-পোষণ দিয়ে যাচ্ছেন। আমি যে পোশাক বর্তমানে পরছি তার সবই উনার দেয়া। আমি খাচ্ছিও উনার সাথে। এরকম অবস্থায় তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা কি একটা খারাপ কাজ হবে না?

আমার বাবা আমার ধর্মীয় অভিভাবক হওয়ায় যখনই আমি কোন লোকের থেকে কোন বিবাহের প্রস্তাব পাই তিনি তা ফিরিয়ে দেন। তাহলে আমি এখন কাকে আমার অভিভাবক হিসাবে গ্রহন করবো? তার উপরে আমার চাচাও একই তাগুতী বাহিনীর অংশ এবং আমার এক ছোট ভাই আছে যার বয়স মাত্র ১২ বছর।

আমি আপনার কাছ থেকে উত্তর চাচ্ছি। আল্লাহ আপনাদের উপর সদয় হোন।
***প্রশ্নকর্তাঃ** আনসারিয়া ঘারবিয়্যাহ*

উত্তরঃ

আল হামদুলিল্লাহ এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর উপর।

আমার সম্মানিত বোন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আপনার বাবার কুফরী সুস্পষ্ট। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী নেই। কারণ আপনার বাবা যে শুধুই তাগুতের বাহিনীতে কর্মরত তাই নয় তিনি এমন কি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ব্যাঙ্গ এবং অপমান করেছেন এবং তিনি নামাজ পড়েন না এবং হিজাবের ব্যাপারে এবং নবী (সাঃ) এর সুন্নাতের ব্যাপারে হাস্য-কৌতুক করেছেন।

এটা আল্লাহর তরফ থেকে আপনার জন্য এক পরীক্ষা। সুতরাং আপনি ধৈর্য্যশীল হোন এবং দৃঢ়তার সাথে আপনার ঈমানকে আঁকড়ে ধরুন। এবং আপনাকে হেদায়াত দান করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করুন। আমরা সবাই জানি নবী (সাঃ) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পাত্রের একজন কিন্তু তারপরও তাঁর চাচা আবু লাহাব এবং আবু তালিব মুশরিক

হিসাবে মারা যান।

যখন নবী ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা বার বার কুফরি করেছিলেন, আল্লাহ তখন ইবরাহিম (আঃ) এর সম্মানে নিচের আয়াতগুলো নাজিল করেন।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য এজন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করছিল যে, সে তাঁর পিতার কাছে আগেই এক ওয়াদা করে রেখেছিল। কিন্তু যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে সে (তাঁর পিতা) আল্লাহর শত্রু। তখন তিনি নিজেকে তার (পিতা) থেকে মুক্ত করে নিলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহিম তাঁর দো'আর প্রতি ছিল একনিষ্ঠ এবং কোমল হৃদয়ের। (সূরা তাওবাহঃ ১১৪)

আমার সম্মানিত বোন, এটা আপনার জন্য জানা জরুরি যে আপনার বাবার ধর্মীয় অভিভাবকত্ব মেনে চলা আপনার উপর বাধ্যতামূলক নয়। তার প্রতি আপনার সম্পর্ক শুধুই হবে দয়া দেখানোর জন্য।

যা নবী (সাঃ) নিজে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেনঃ

إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها

আবু অমুক তমুকের পরিবার আমাকে রক্ষাকারীদের কেউ নয়। আমার রক্ষাকারী হলেন আল্লাহ এবং সালেহীন মু'মিন বান্দারা। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এবং এজন্য আমি তাদের প্রতি ভাল এবং দায়িত্বশীল হব।

এর মানে হল অভিভাবকত্ব হল শুধুই দয়া দেখানো। এই হাদিস থেকে শিক্ষা নেয়া যায় যে কুফফারদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে দয়া দেখানো কোন প্রতিবন্ধকতা নয়।

ইমাম জাসসাস (রঃ) বলেনঃ

قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان} فيه نهى للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إليهم وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم وسواء بين الآباء والإخوان في ذلك , إلا أنه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف بقوله تعالى : {ووصينا الإنسان بوالديه...}- إلى قوله { وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা তোমাদের বাবা (মা) এর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর যদি তারা ঈমানের উপর কুফরীকে ভালবাসে।' এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদের থেকে সাহায্য নিতে বা, তাদের কাছে সাহায্য চাইতে এবং কোন দায়িত্ব অর্পন করতে নিষেধ করেছেন। এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি বাধ্যতামূলক করেছেন কুফফারদের থেকে প্রকাশ্য ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এবং কুফফারদেরকে সম্মান দেখানো তাদের প্রশংসা করা নিষেধ করেছেন যদিও তারা তাদের মাতাপিতা অথবা, সহোদর হোক না কেন। যদিও একজন কুফফার বাবার প্রতি দয়াশীল হতে এবং তার উপকার করাকে ফরজ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমরা লোকদেরকে তাদের পিতামাতার প্রতি দয়ালু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমাদেরকে আমার সাথে শরিক করতে বলে তাহলে তোমরা তাদেরকে মান্য কর না। তবে তাদের প্রতি দয়ালু হও।' (আহকামুল কুরআন, ৪/২৭৮)

সুতরাং আপনি আপনার বাবার সাথে দয়ার সম্পর্ক এবং ভাল আমলের মাধ্যমে জুড়ে থাকুন। আল্লাহ বলেনঃ

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“তাদের প্রতি এই দুনিয়ার জীবনে সদয় হও” (সূরা লোকমানঃ ১৫)

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ

والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وقد قدمت عليه خالتها وقيل أمها من الرضاعة فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: (نعم). وراغبة قيل معناه: عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها

এই আয়াত হল দলীল যেঃ একজনের উচিত হবে সে যেন তার কুফফার পিতামাতাকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করে যদি তারা দরিদ্র হোন এবং তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা উচিত এবং তাদের জন্য দো’আ করা উচিত যেন তারা বিশ্বাসী হতে পারেন। আসমা (রাঃ), আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মেয়ে বর্ণনা করেন যে, একবার আমার একজন চাচী আমাকে দেখতে আসলেন যিনি আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন আমাকে বুকের দুধ খাইয়েছিলেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করি, “হে আল্লাহর নবী (সাঃ) আমার মা এসেছেন এবং তিনি আগ্রহী। আমি কি তার প্রতি দয়ালু আচরণ করবো? তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” – (তাফসীর কুরতুবী, ১৪/৬৫)

এখানে আগ্রহী বলতে বুঝানো হচ্ছে যে তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী। ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে মনে হয় তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি অপ্রয়োজনে আসমা (রাঃ) এর ঘরে বেড়াতে যান নি।

সম্মানিত বোন! আমি আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের পরামর্শ দিতে পারি। যেন আপনি এই ব্যক্তির ভরণ-পোষণ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন ফলে সে আপনার ঈমানের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।
আর বিবাহের জন্য যে ধর্মীয় অভিভাবকত্বের দরকার হয় তার ব্যাপারে বলছি, আপনি আপনার বাবার কোন নিকট আত্মীয়কে অথবা, আপনার খালার কোন ছেলেকে বাছাই করে নিতে পারেন যার ঈমান সম্বন্ধে আপনি ভালো ধারনা রাখেন।

এবং যদি আপনার বংশীয় মুরব্বী অথবা খালাদের সন্তানদের মধ্যে থেকে নিজের জন্য যদি কাউকে ওয়ালী হিসেবে না পান, তবে আপনি অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তি অথবা কোন মুসলিম সংগঠনকে আপনার বিয়ের ওয়ালী হিসেবে বেছে নিতে পারেন। যেন আপনার পিতার সাথে এমন জটিল পরিস্থিতিতে না পরে যান, যা আপনার ক্ষতির দিকে গড়াবে।

এটাও সম্ভব যে, আপনি বর্তমানে স্বাভাবিক যে পদ্বতি চালু আছে সে পদ্বতিতে আপনার আক্বদ সম্পন্ন করে ফেলতে তাকে সুযোগ দিয়ে দিলেন এবং পরে যখন আপনি আপনার জন্য কোন মুসলিম অভিভাবক বেছে নিতে পারবেন তখন তার অভিভাবকত্বে আক্বদ পুনরায় সম্পন্ন হবে।

এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য যিনি সমগ্র জাহানের রব।

উত্তর দাতাঃ
শায়েখ আবু মুনযির আল-শানকিতি
শরীয়াহ কমিটির সদস্য, মিনবার তাওহীদ ও জিহাদ

৩। গ) আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পুলিশ বিভাগে চাকরি করা সম্পর্কেঃ

প্রশ্নঃ একজন লোক তাঁর চরম আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পুলিশ বিভাগে কর্মরত। সে এই চাকুরিটি ছাড়তে পারছে না কারণ সে শিক্ষিত না এবং চাকুরি করে আয় করার তাঁর আর অন্য কোনো উৎসও নেই।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সে শুধু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরই দেখাশুনা করে না বরং সে তাঁর পিতা-মাতা এবং ভাইদেরকেও আর্থিকভাবে সাহায্য করে কারণ তাঁর পিতা এবং ভাইদের কাজ করে প্রাপ্ত আয় বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ঠ উপযোগী নয়। তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং তারা খুবই গরীব।

তাই... প্রিয় **শাইখ আবু ওয়ালিদ আল-মাকদিসি!** ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে একটি ফতোয়া দিন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনাকে রক্ষা করুন এবং সত্যকে প্রকাশ করার শক্তি দান করুন।

উত্তরঃ

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবৃন্দ, তাঁর সাহাবারা এবং যারা তাঁকে অনুসরন করে তাঁদের প্রতি।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে পুলিশ এবং অন্যান্য এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর আইনকে মুছে ফেলার জন্য এবং এর বদলে মানব রচিত আইনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

যেকোন মুসলমান যে তাঁর দ্বীন সম্পর্কে সচেতন তাঁর কাছে এই ধরনের মুরতাদ বাহিনীতে কাজ করা অগ্রহনযোগ্য হবে। অন্যদিকে সে নিজেকে এবং নিজের ঈমানকে এই ধরনের মুরতাদ বাহিনীর নোংরামী থেকে হিফাজত করবে। এটা এ কারণে যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইনকে গ্রহন করার বোঝা বহন করে এবং যে এই ধরনের বাহিনীতে কাজ করে তাঁর উপর এই মানব রচিত আইনকে প্রয়োগ করে। রিজিক কমে যাওয়া এবং সম্পদদের স্বল্পতার ইত্যাদি উদ্বেগ এই চরম ঘৃণিত কাজের তুলনায় কিছুই না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ

“তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ হরম প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা কাসাসঃ ৫৭)

মনে রাখা দরকার যে কুফরী কাজ করা কোনও অবস্থাতেই গ্রহনযোগ্য না যতক্ষন পর্যন্ত না কাউকে বাধ্য করা হচ্ছে এবং সাহায্য করার কেউ না থাকার কারণে সে তার জীবন হারানোর আশঙ্কা অথবা অঙ্গহানি হবার আশঙ্কা করছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ

“যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। এরাই তারা, আল্লাহ তা'য়ালা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ড জ্ঞানহীন। বলাবাহুল্য পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।” (সূরা নাহল ১০৬-১১০)

মনে রাখা দরকার যে এইখানে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তাআলা সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যারা কোনও ধরনের চাপ ছাড়াই কুফরকে গ্রহণ করেছে; কেউ যদি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাহলে এটি তাঁকে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। অতএব যারা এটা করে (আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়), তারপর এই ধরনের ব্যক্তিদের আত্মা, শ্রবন শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি কুফরের উপযুক্ত হয়ে উঠে। এটা এ কারণে যে তারা তাদের মধ্যে থেকে যারা অসচেতন, অভিশপ্ত এবং বিচার দিবসের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত।

তাই যে আনুগত্যশীল হতে চায় তাকে অবশ্যই কুফরের ও শিরকের এই পথকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং অবশ্যই দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাঁকে অবশ্যই তাঁর নফস, তাঁর ইচ্ছা এবং জীন ও মানব জাতির সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

এই পথে চলতে গিয়ে যেকোন ধরনের কষ্টে সে সবর করবে। এই পথেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন ও তাঁর উপর রহমত বর্ষন করতে পারেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহ সবচেয়ে ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তাঁর এটা মনে রাখা দরকার যে, সে আল্লাহ তাআলার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কোনও ধরনের কঠোর পরিশ্রম ছাড়া আল্লাহ তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দিতে পারেন যা সে কল্পণাও করতে পারে না।

আল্লাহ বলেনঃ

“এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।” (সূরা তালাকঃ ২-৩)

আল্লাহ রব্বুল আলামী আরও বলেনঃ

“যে আল্লাহকে ভয় করে,আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।” (সূরা তালাকঃ ৪)

এবং তারপর তাঁর পরিবার, তাঁর পিতামাতা এবং তাঁর আত্বীয় স্বজন আল্লাহর শাস্তি থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। বরং তাঁরা বিচার দিবসের দিনে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

আল্লাহ বলেনঃ

“সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।” (সূরা আবাসাঃ ৩৪-৩৭)

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেনো তাঁকে এবং তাঁর মতো অন্যান্যদেরকে ঈমানদারদের পথে দৃঢ়ভাবে থাকার তৌফিক নসীব করেন এবং যারা এইভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তাদের পথ থেকে তাঁকে হিফাজত করেন।

শরীআহ কমিটি
মিনবার আত-তাওহীদ ওয়াল-জিহাদ ওয়েবসাইট

সীরাত ও জীবনী

৪। শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

আজ আপনাদের সাথে এমন একজন আলেমের পরিচয় করিয়ে দিব যিনি শুধু যুগশ্রেষ্ঠ আলেমই ছিলেন না যুগশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ ছিলেন। যার লেখা ও জীবনী পড়ে আমার মত লক্ষ কোটি তরুণ আলোর দিশা পেয়েছে। যিনি অনান্য আলেমের মত শুধু এসি রুমে বসে লেকচার দেন নি রণাঙ্গণে শরীরে যুদ্ধ করে প্রাক্টিকেলি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের সবার প্রিয় ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ।

আসবাহ আল হারতিয়া। ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় এ গ্রামের নাম স্বর্ণারে লিপিবদ্ধ। কারণ এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে বহু মহামানবকে। বহু মুজাহিদ আর সমরবিদকে। বহু দার্শনিক আর চিন্তাবিদকে। বহু সাহিত্যিক আর ভাষাবিদকে।

১৯৪১ সাল। আসবাহ আল হারতিয়া তখন পরাধীন। ইহুদীদের পদভারে রক্তাক্ত। তার দুরন্ত বায়ুর বুকে সন্তানহারা মায়ের আহাজারি। এতীম শিশুদের আর্তচিৎকার। অসহায় বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের চোখে চোখে অশ্র“র বান। কৌমার্যছিন্ন যুবতী আর তরুণীদের চোখে প্রতিশোধের লেলিহান আগুন। ঠিক তখন আসবাহ আল হারতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এক নবজাত সন্তান। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম।পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত হন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে। মহব্বত করতে শিখেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে; আল্লাহর পথে জিহাদে রত বীর বাহাদুরদেরকে; সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে। আখিরাতের চিন্তা-ফিকির আর শাহাদাতের তামান্না শৈশব থেকেই তার চরিত্রে ফুটে উঠতে থাকে।

আব্দুল্লাহ আযযাম এক ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর। সদা গম্ভীর, নিষ্ঠাবান, চিন্তায় ডুবে থাকা এক কিশোর। নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা তার চরিত্রকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অল্প বয়সেই তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে মুসলমানদের মাঝে জাগ্রত করতে পেরেশান হয়ে পড়েন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তার অসাধারণ গুণাবলী দেখে শিকরা হতবাক হয়ে যান। তারা ভাবতে থাকেন, আমাদের এ সন্তান কালের ব্যবধানে নিশ্চয় বড় কিছু হবে। হয়তো আল্লাহ তার দ্বারা ইসলামের সংস্কারের কাজ নিবেন। সুনামের সাথেই তিনি লেখাপড়া করতে থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। কাসে সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্তেও তিনি সবচেয়ে বেশী সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন। এরপর তিনি এগ্রিকালচার কাদরী কলেজে ভর্তি হন। এবং সেখান থেকেই ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

তারপর দক্ষিণ জর্দানের আদ্দির নামক গ্রামে শিকতা পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু তার পিপাসার্ত মন তখনো ছিল অস্থির-উতলা। তাই দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে শরিয়াহ(ইসলামী আইন) এর উপর বিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৭ সাল। ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখল করে নিল। রক্তে রঞ্জিত হল পশ্চিমতীর। চোখের সামনে দেখলেন, নির্যাতন আর নিপীড়নের ভয়াল চিত্র। বুক ফাটা আহাজারি, কান্না আর বিলাপের অসহনীয় বেদনায় টনটন করতে থাকে তার হৃদয়। চোখেই জমাট বেধে যায় অশ্র“। তিনি শপথ করলেন, না, আর নয়, ইহুদীদের দখলদারিত্বের অধীনে তিনি আর থাকবেন না। তার পেশীতে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে। চির চেনা শান্ত সমাহিত সেই আযযাম যেন জলন্ত অঙ্গার। তবে অত্যন্ত নিরব। দারুণ চিন্তাশীল। সময়ের ব্যবধানে হলেও তিনি সফলতার মুখ দেখতে চান। অত্যাচারীর হাত চিরতরে উড়িয়ে দিতে চান।

১৯৭০ সাল। তিনি তখন জর্দানে, ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ দিলেন। শুরু হল তার জীবনের

আরেক অধ্যায়। চিন্তায় লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন, না, তাকে আরো পড়তে হবে। তাকে শিখতে হবে। অল্প বিদ্যা নিয়ে সামনে চলা বড়ই কঠিন। অত্যন্ত দুষ্কর। তাই তিনি চলে এলেন মিসরে। ভর্তি হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করলেন। এবং ১৯৭১ সালে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন। সে বৎসরই তিনি ইসলামি আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসূলুল ফিকহ) এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ) এর (১৯০৬-১৯৬৬) পরিবারের খোঁজখবর নিতে যান।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম দেড় বৎসর ফিলিস্তিনের জিহাদে অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। কিন্তু এ সময় তিনি মানসিকভাবে প্রশান্ত ছিলেন না। কারণ তিনি দেখতেন, যারা ফিলিস্তিনের জিহাদে রত তাদের অনেকেই ইসলাম থেকে অনেক দূরে। মাঝে মধ্যেই তিনি দুঃখ করে বলতেন, কিভাবে তারা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ তারা প্লেইং কার্ড, গান শোনা আর টেলিভিশনের অশ্লীল ছবি দেখে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে! তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতেন, হাজারো মানুষের জনবহুল জায়গায় সালাতের জন্য আহবান করা হলে একেবারেই অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত হয় যাদের হাতের আঙ্গুলী দিয়ে গোনা সম্ভব। তিনি তাদের ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা তাকে প্রতিহত করত। বাধা দিত। একদিন তিনি এক মুজাহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনের এই অভ্যুত্থানের সাথে কি দ্বীনের কোন সম্পর্ক আছে? তখন সেই মুজাহিদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলল, এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই।এ কথা শোনার পর তার মন ভেঙে যায়। তিনি ফিলিস্তিনের রণাঙ্গন ত্যাগ করে সৌদি আরবে চলে আসেন। এবং জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে ইসলামের নির্মল চেতনা ও জিহাদী জযবা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করতে পারেন, মুসলিম উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারবে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী। এ ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়। তখন থেকে জিহাদ আর বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ আর বিনোদনের সঙ্গী। তিনি অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে থাকেন, আর কোন সমঝোতা নয়, নয় কোন আলাপ আর আলোচনা। জিহাদ আর রাইফেলই হবে সমাধানের একমাত্র পথ।

১৯৮০ সাল। হজ্জে এসেছেন এক আফগান মুজাহিদ। সহসা তার সাথে দেখা হয়ে যায় ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহ) এর। কথার তালে তালে সখ্যতা বৃদ্ধি পেল। একের পর এক শুনলেন আফগান জিহাদের অবিশ্বাস্য কাহিনীমালা। মুজাহিদদের ত্যাগ, কুরবানী আর আল্লাহর মদদের কাহিনীমালা শুনতে শুনতে ড. আব্দুল্লাহ আযযাম অভিভুত হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এতোদিন ধরে তিনি এ পথটিই খুঁজে ফিরছেন। এরই তালাশে আছেন। এরপর তার মন অস্থির হয়ে উঠে। অশান্ত হয়ে উঠে। তিনি বাদশাহ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিকতার পেশা ত্যাগ করে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে আসেন। শুরুতে তিনি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু আফগান মুজাহিদ নেতার সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠে। তখন আফগান জিহাদ সম্পর্কে তিনি সার্থক ও বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেন। নানা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। চলমান জিহাদের রুপরেখা অনুধাবন করেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে আফগান জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়-মন, মেধা-যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু অকাতরে উজাড় করে দান করেন। আত্মতৃপ্ত শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের কন্ঠ চিরে বার বার রাসূলের এই বাণীটি মুজাহিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত, “আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে এক মুহুর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বৎসর দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” তারপর তা তাদের হৃদয় ছুঁয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শাহাদাতের আশায় তাদের অস্থির করে ছাড়ত। ব্যাকুল করে দিত।

আব্দুল্লাহ আযযাম ও তাঁর প্রিয় শিষ্য উসামা বিন লাদেন পেশোয়ারে অবস্থানকালে মুজাহিদদের সেবা সংস্থা বায়তুল আনসারে যোগ দেন। এ সংস্থা আফগান মুজাহিদদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করত। নতুন মুজাহিদদের পাকিস্তানে প্রশিণ দিয়ে আফগানিস্তানে সম্মুখ যুদ্ধে প্রেরণ করত। ইতোমধ্যে তিনি তার পরিবারকেও নিয়ে আসেন।

এরপর আব্দুল্লাহ আযযাম আরো সামনে অগ্রসর হলেন। জিহাদের প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল হলেন। হাতে তুলে নিলেন অস্ত্র। ইসলামের শত্র“দের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্মুখ লড়াইয়ে। অসম সাহসিকতায় বীরের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন।

আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠলেন। ছুটে চললেন এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। এক রণত্রে থেকে আরেক রণেত্র। আহ! এ যেন আরেক জীবন। এ জীবনের কোন মৃত্যু নেই। এর স্বাদ, রঙ, রুপ আর প্রকৃতি একেবারে আলাদা। অনন্য। তিনি আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে ছুটে গেলেন। লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পন্ধসের উপত্যকা, কাবুল আর জালালাবাদে ছুটে চললেন বিরামহীন গতিতে। ফলে আফগান রণাঙ্গনের সাধারণ যোদ্ধা ও মুজাহিদদের সাথে তার পরিচয় হয়। সখ্যতা হয়। বন্ধুত্ব হয়। সবাই তাকে তাঁর হৃদয়ের উদারতা, জিহাদী জযবা, আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার আকুতি, মুসলিম উম্মাহর দরদী ব্যাক্তিত্বের কারণে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে থাকে। মহব্বত করতে থাকে।

এরপর তিনি আবার ফিরে আসেন পেশোয়ারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এবার তিনি একেবারে টইটুম্বুর। গোটা আফগান রণাঙ্গনের সমস্যা-সমাধান তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে। জিহাদের এই কাফেলাকে সঠিক পথে পরিচালনার ও চুড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার তামান্নায় তিনি অধীর অস্থির। তাই মুজাহিদদের মাঝে সংস্কারমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। মুজাহিদদের পরিশুদ্ধ করতে লাগলেন। জিহাদের পথে নানা বিভ্রান্তির আলোচনা করতে লাগলেন। বিভক্ত মুজাহিদদের গ্র“পগুলোকে একই কাতারে নিয়ে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে দুআ করতে লাগলেন। যারা কখনো জিহাদের কাতারে শামিল হয়নি; সম্মুখ লড়াইয়ে অংশ নেয়নি তাদের প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

আফগান মুজাহিদ নেতাদের মাঝে তাঁর প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই সবাই তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর প্রস্তাব, পরিকল্পনাকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারত না।

এরপর তিনি মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের ব্যাপারে জাগ্রত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। আফগান জিহাদের পবিত্র আহবানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ছুটে যান বিশ্বের বহু দেশে। সাক্ষাৎ করেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজসেবক ব্যক্তিত্বদের সাথে। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে থাকেন। চারদিকে ছুটতে থাকে অনল প্রবাহ। তিনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য, শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের লুন্ঠিত ভূমিকে উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ফাঁকে ফাঁকে তার কলমও ছুটতে থাকে। তিনি জিহাদ বিষয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন। যা এখনো পাঠককে আন্দোলিত করে। আলোড়িত করে। জিহাদের পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। পুস্তকগুলোর শীর্ষে রয়েছে, এসো কাফেলাবদ্ধ হই, আফগান জিহাদে আর রহমানের নিদর্শনসমূহ, মুসলিম ভূমিসমূহের প্রতিরা, কারা জান্নাতের কুমারীদের ভালবাসে ইত্যাদি।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযামের অবিরাম প্রচেষ্ঠা, মেহনত-মুজাহাদা সফলতার আলো দেখতে পায়। তিনি বিশ্বের মুসলমানদেরকে আফগান জিহাদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সম হন। ফলে আফগান জিহাদ শুধু আফগান জনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা আন্তর্জাতিক রুপ লাভ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ছুটে আসতে থাকে। তারা ইহুদী-খৃস্টানদের হাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত মুসলিম মা-বোনদের উদ্ধারে শপথ গ্রহণ করতে থাকে এবং প্রত্যেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে।

তিনি তার মানসপটে একটি চিত্রই এঁকেছিলেন। তাহল, জিহাদের মাধ্যমে খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং বারবার বলতেন, পৃথিবীর বুকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিকতার প্রস্তাবকে অকুন্ঠ চিত্তে প্রত্যাখান করেছেন। আর দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তিনি ততণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতণ পর্যন্ত হয় তিনি শহীদ হবেন, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

আফগান রণাঙ্গন ছিল তাঁর স্বপ্নের চারণভূমি। তাই তিনি বলতেন, আমি কখনো জিহাদের ভূমি পরিত্যাগ করব না, তিনটি অবস্থা ছাড়া। হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব, নতুবা হাত বাঁধা অবস্থায় আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিস্কার করা হবে।

একদিন মিম্বরে খুতবা দানকালে তিনি বললেন, “আমি মনে করিম আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বৎসর। সাড়ে সাত বৎসর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বৎসর কেটেছে ফিলিস্তিনের জিহাদে..”

এছাড়া আমার জীবনের বাকী সময়গুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই।” তিনি আরো বললেন, জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না যতণ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদত করা হবে। এ জিহাদ চলতে থাকবে যতণ পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতণ পর্যন্ত না সব নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতণ পর্যন্ত আমাদের সম্মান ও লুণ্ঠিত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা হবে। জিহাদ হল চিরস্থায়ী মর্যাদার পথ।শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম মুসলিম উম্মাহকে ল্য করে জুমআর খুতবায় বলতেন, মুসলিম জাতি কখনো অন্য জাতি দ্বারা পরাজিত হয়নি। আমরা মুসলমানরা কখনো আমাদের শত্র“র কাছে পরাজিত হইনি। বরং আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের কাছেই পরাজিত হয়েছি।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মানুরাগ, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, সংযমশীলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক অলংকার। তিনি কখনো কারো সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না। তরুণদের তিনি ভিন্ন চোখে দেখতেন। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সব ধরনের ভয়-ভীতি মাড়িয়ে হৃদয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে দাউদ আলাইহিস সালামের সুন্নাহ অনুযায়ী অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন করতেন আরেকদিন বিরত থাকতেন। এভাবে তিনি সারা বৎসর সিয়াম পালন করতেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং অন্যদেরও এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত করতেন।

একদা এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। পেশোয়ারে কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ঘোষণা দিল, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম কাফের হয়ে গেছে। কারণ তিনি মুসলমানদের সম্পদ অপচয় করছেন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম এ সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন না। স্তিও হলেন না। তাদের সাথে কোন রুঢ় আচরণও করলেন না। বরং তাদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন। এরপরও কিছু লোক বিরত হল না। তারা তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে লাগল। অপবাদ ছড়াতে লাগল। শাইখ আযযাম কিন্তু একেবারেই নিরব। নির্বিকার। তিনি তাদের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। বরং নিয়মিত তাদের নিকট উপহার সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। তারপর একসময় তাদের ভুল ভাঙল। তখন তারা বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের মত মানুষ দেখিনি। তিনি আমাদের নিয়মিত অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেতেন অথচ আমরা তার বিরুদ্ধে কটুবাক্য বলতাম।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টা ও মুজাহাদার ফলে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্র“প একত্রিত হল। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শত্র“দের মাঝে ভীতি ছড়িযে পড়ল। মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে লাগল। এ অবস্থায় শত্র“রা তাকে সহ্য করতে পারল না। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার কৌশল খুঁজতে লাগল।

পেশোয়ারে তিনি এক মসজিদে নিয়মিত জুমআর নামায পড়াতেন। নামাযের আগে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতেন। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ তার বক্তৃতা শুনতে ছুটে আসত। ১৯৮৯ সালে শত্র“রা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার মিম্বারের নিচে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী টিএনটি বিস্ফোরক রেখে দিল। এটা এতোই ভয়াবহ ছিল যে তা বিস্ফোরিত হলে পুরো মসজিদটি ধ্বসে পড়ত। মসজিদের কেউ বাঁচত না। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল অন্য। তাই তা বিস্ফোরিত হয়নি।

এ দিকে শত্রুরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর। শুক্রবার। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে যেতেন সে পথে তিনটি বোমা পুঁতে রাখল। রাস্তাটি ছিল সরু। একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে

এসে থামল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তাঁর দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। তার আরেক পুত্র তামীম আদনানী আরেকটি করে পিছনে পিছনে আসছিল। শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে শত্র"দের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরকের ভয়াবহ আওয়াজে কেঁপে উঠল শহর। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষেরা দৌঁড়ে এল। ইতোমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। অকুস্থলে তারা গাড়ির বিস্তি টুকরো ছাড়া আর কিছুই পেলনা। বিস্ফোরকের ফলে তাদের দেহ ১০০ মিটার উপরে উঠে গিয়েছিল। তাদের দেহ বিভিন্ন গাছের ডালে, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযামের দেহকে রক্ষা করলেন। দেহটি সম্পূর্ণ অত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তাঁর মুখদিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।তার শাহাদাতের সংবাদে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এলো। কান্নার রোল পড়ে গেল। মুজাহিদদের শিবিরে শিবিরে সে কান্না ছড়িয়ে পড়ল। স্তব্ধ হয়ে গেল তার বন্ধু-বান্ধব আর নিকটতর ব্যক্তিরা।

"يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ বিকাশ আর কিছুই চান না। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

১৯৯৯ সাল। আল জাজিরা টিভি চ্যানেল শাইখ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাৎকার নিল। তিনি তাতে বললেন, "শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মাহ। একটি জাতি। তার শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তার মতো দ্বিতীয় আরেক সন্তান জন্ম দিতে পারেনি।"

টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে, "বিংশ শতাব্দীতে জিহাদকে পূনঃর্জাগরণে তিনিই দায়ী।"

চেচনিয়া জিহাদের ফিল্ড কমাণ্ডার ইবনুল খাত্তাব রহ. বলতেন, "১৯৮০-এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুলাহ আযযাম ছিলেন এমন একটি মুদ্রিত নাম যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে। তিনি (আব্দুল্লাহ আযযাম) মুজাহিদীনদের ব্যাপারে বলতেন, যে কেউ জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল, 'শহীদী কাফিলার সাথে'।"

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহর কলম থেকে কয়েকটি লাইনঃ

মানুষ যখন পাপ কাজ করে তখন কেউ তা দেখে ফেলে কিনা তাঁর ভয় করে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনা যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। প্রতিটি মুহুর্তে সে আল্লাহর সামনে রয়েছে। মুহুর্তের জন্যও সে আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারছেনা।একবারের ঘটনা। এক ব্যক্তি নির্জনে এক আরব মহিলার সাথে সাক্ষাত করল। অসৎ কর্মের জন্য তাঁকে প্ররোচনা দিল। বলল, আমাদের তো আকাশের তারকা ছাড়া আর কেউ দেখছে না। মহিলা বলল, তাহলে তারকার সৃষ্টিকর্তা কী করছে?- ***শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ।***

লাঞ্ছনার মূলে রয়েছে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ আর ভোগবিলাসের আয়োজন।-- ***শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ।***

আমার এক মরহুম উস্তাদ এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন, তিনি বলতেন, তোমরা রাজনীতি শিখতে চাও? রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুনতে চাও? শত্রু মিত্র চিনতে চাও? তাহলে কুরআনের নিকট এস। কুরআনই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, কারা তোমাদের চিরশত্রু। কারা তোমাদের বিরুদ্ধে চিরদিন ষড়যন্ত্র করে যাবে, যাচ্ছে। তাঁদের অতীত ইতিহাস কী। অন্যান্য নবীদের সাথে তারা কি আচরণ করেছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।- ***শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ।***

এটাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট এক শাস্তি যে, নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিম ভাইদের প্রতি তার হৃদয়ে একটু দয়া বা অনুকম্পা থাকবে না। এ শাস্তি অত্যন্ত ভয়াভহ। এর পরিনাম আরো কঠিন।- ***শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ।***

ফিসক কী? ফিসক হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয় প্রবৃত্তির প্রেরণা ছোট ছোট পাপ কাজ করার মাধ্যমে। আর প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা কখনো সম্ভব হয় না। প্রবৃত্তি হলো সমুদ্রের লবণাক্ত পানির মত। পিপাসা নিবারণের জন্য সমুদ্র থেকে এক আজলা পানি পান করবে দেখবে পিপাসা মিটে না। বরং আরো তীব্র হয়েছে।-- **শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম রা.**

"..সুতরাং বলছি, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? তোমাদের সামনে হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। আমল কর। জান্নাতের পথকে সুপ্রশস্ত কর। জীবন একেবারেই সংক্ষিপ্ত। কহন শেষ হয়ে যাবে বলতে পার না। আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাকে এ জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছেন। এখানে আকাশের দরজা সদা উন্মুক্ত। জান্নাতের দরজা খোলা। তোমাদের মাঝে জান্নাতের মাঝে এতটুকুই দূরত্ব যে, তুমি ইখলাসের সাথে তাওবা করবে। তারপর একটি গুলি উড়ে আসবে আর তোমাকে জান্নাতে পৌছে দিবে। তারপর চিরকাল সুখ আর সুখ। যার কোন অন্ত নেই। কোন শেষ নেই।...-- ***শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ।***

মনে করুন, আপনি একটি পশু জবাই করছেন। জবাই করার সময় এই পশুর কিছু রক্ত আপনার শরীরে লেগে গেলো। তখন কি আপনি বলবেন, এই পশু অসভ্য?!

ঠিক তদ্রূপ এই পশ্চিমা কাফিররা, আমেরিকানরা আমাদেরকে জবাই করতে চায় । আর আমরা যখন এর প্রতিক্রিয়ায় একটু শ্বাস নিতে চাই, একটু আওয়াজ করি, এই জুলুমের মোকাবেলায় আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র উঠাই - তখন তারা বলে - "দেখ, দেখ- এরা অসভ্য, বর্বর,আনকালচার্ড, সন্ত্রাসী !"

এই যদি হয় সন্ত্রাস, তাহলে হ্যা, আমরাই সন্ত্রাসী! এবং ত্রাস সৃষ্টি আল্লাহর কিতাবে ফরজ করা হয়েছে ! হে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য! যেনে রাখো, আমরাই ত্রাস সৃষ্টিকারী! আমরাই তোমাদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী!

আল্লাহ তাআলা বলেন-"আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে, যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন 'ত্রাস সৃষ্টি হয়' আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে..."
[আনফালঃ ৮:৬০]